বালির চড়া

নাজিব ওয়াদুদ

ছোট্ট অপ্রশস্ত মাঠের পর বাঁধটা পেরিয়ে গাঙের পাড়ে এসে দাঁড়াল আমেনা। তখন দেশি মুরগির বড়সড় ডিমের কুসুমের মতো টাটকা লাল সূর্যটা পুবের আকাশে কেবল উঁকি দিচ্ছে। আকাশের রুপোলি শাদাটে জমিনে ছড়িয়ে পড়ছে তার রঙিন আভা। বায়োস্কোপের মতো কোনো যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে সেখানে পরিবর্তন ঘটে চলেছে প্রেক্ষাপটের। ফুটে উঠছে নতুন থেকে নতুনতর দৃশ্য। একটু পর পুরোপুরি মাথা তুলে ঝুলবে সূর্যটা। তারপর ধীরে ধীরে কাঁসার থালার **মতো চকচকে চোখ ধাঁধানো রং ধরবে।**

যাত্রা করবে পুব থেকে পশ্চিমে। শুরু হবে নতুন আরেকটা দিনের।

পিটালুর ছোবড়া দাঁতন ফেলে দিয়ে চারপাশটা একবার দেখল আমেনা। মৃদু বাতাস দিচ্ছে এখন। ভোরের শীতল পরশ শরীরে আদরভেজা আবেশ জাগায়। কাঁখের কলসিটা পায়ের কাছে রাখে। দু'হাতে চুল আউলা-ঝাউলা করে মাথায় বাতাস লাগায়। শাড়িটা খুলে পরে। সারারাতে গুমোট গরমে ঘিনঘিনে ঘামে ভেজা গোটা শরীর। গায়ের ত্বক তো নয়, যেন সুনীল চামারের বাড়িতে শুকাতে দেওয়া লবনমাখানো চামড়া। ফাঁকা মাঠের শীতল বাতাসে ঘর্মাক্ত দেহখানা জুড়িয়ে যায়। ভোরের এই স্নিগ্ধ ও শান্ত নির্জনতায় কেমন এক পবিত্র আবেশে তার মন-প্রাণ ভরে ওঠে।

গাছে গাছে পাখিদের প্রভাতী শোরগোল নিস্তব্ধপ্রায়। ভোরের গান-শেষে এখন তারা দিনের কাজ শুরু করবে। তার আগে শেষ বিশ্রামটুকু সেরে নিচ্ছে। এরপর সারাদিন ধরে চলবে জীবনের যত আয়োজন।

গাছের পাতায় বাতাসের শিহরণ লালচে সূর্যালোকে ঝলকে ঝলকে ওঠে।

গ্রাম থেকে নদীর পাড় বেশি দূরে নয়। মাঝে ছোট্ট এক ফালি মাঠের ফারাক। আমেনাদের পুকুর পাড়ে আকাশছোঁয়া তালগাছ। তার নিচে দাঁড়িয়ে এদিকটায় তাকালে এই ছায়া-ছায়া ভোরে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। চিনতেও খুব কষ্ট হবে না। কিন্তু নদীর পানি আরো দুরে। বেশ দূরে। এবার চর পড়েছে নদীর ওপাড় ঘেঁষে, এপারেই মূল স্রোত। তবু পোয়া মাইলটাক বালুর চর ভেঙে তবে পৌঁছতে হবে সেখানে।

কলসিটা কাঁখে নিয়ে চলে নামল আমেনা।

শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছে বিশাল পদ্মার উদোম বুক। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে, কেবল ধুধু বালুচর। বালুর সমুদ্রে দৃষ্টি হারিয়ে যায়। তার শেষ খুঁজে না পেয়ে নজর ফিরে আসে পায়ের কাছে। তখন চোখ দুটো সরু করে সামনে তাকালে পোয়া মাইলটাক দূরে দেখা যায় সাদা ফিতার মতো সরু এক চিলতে চিকচিকে রুপোলি ধারা। সেটাই পদ্মা নদী। শুকিয়ে শুকিয়ে এমনই শীর্ণ।

খচখচে বালুর ওপর পাতলা পলিমাটির আস্তরণ। আমেনার পায়ের নিচে শুকনো পাতার মতো মুচমুচ শব্দ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় পলির চাদর।

চর পেরিয়ে গাঙের কিনারায় পৌঁছল আমেনা। পানিতে পা ডুবিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকল, কাচের মতো স্বচ্ছ, ঝকঝকে, পরিষ্কার পানি। আর কী শীতল!

নদীর তলায় লাল সাদা কালো নানান রঙের বড় বড় বালুকণা। পায়ের প্রায় দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম ভাসতে থাকে মৃদু স্রোতের টানে। সুড়সুড়ি লাগে। পানির নিচে উদোম পা দুটো ভীষণ ফরসা দেখায়। চকচক করে। রুপোলি ইলিশের পেটের মতো ঝিলিক মরে। পানির আয়নায় নিজের মুখখানা দেখার চেষ্টা করে আমেনা। কিন্তু পারে না। ছোট ছোটো ঢেউ তার প্রতিবিম্বকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেয় না। ভেঙে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নিরুদ্দেশে। হঠাৎ চমকে ওঠে সে। সত্যিই সে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ভেঙে হারিয়ে যাচ্ছে না তো!

শিগগিরই তার ঘোর কাটে। তখন দুহাতে ভর দিয়ে পায়ে টেনে টেনে আরো একটু গভীরে নামে। পানি তার বুক ছুঁই-ছুই করছে। শরীরটা বার কয়েক শিউরে শিউরে ওঠে কী এক শীতল তৃপ্তিকর আবেশে। মুখে গলায় দুহাত ভরে পানি ছিটায়। রাতের গুমোট গরমে আধসেদ্ধ প্রায় দেহখানা রস-রং ফিরে পেয়ে পুঁইডাঁটার মতো সতেজ হয়ে ওঠে।

আকাশে এতটুকু মেঘ কি মলিনতার দাগ নেই। নীল কাচের মসৃণ ছই যেন ঢেকে রেখেছে পৃথিবীটাকে। সামনের নদীর ওপারে ধুধু বালুর চর। উঁচু নিচু টিলার মতো এবড়োখেবড়ো। এলোপাতাড়ি। ডাইনে-বাঁয়ে সরু নদীটা একটা গিরিপথের মতো হারিয়ে গেছে দুই চরের মাঝখানে। বুক শূন্য করা একটা ভিজে দীর্ঘশ্বাস সকালের পাতলা শুকনো বাতাসকে আর্দ্র করে তোলে। দুহাতে আঁজলা ভরে পানি তুলে মুখে ঝাপটা মারে আনো। কয়েকবার। তারপর ডুব দেয়। দমভর ডুবে থাকে। পানির শীতল স্পর্শ তাকে আপ্লুত করে রাখে। একটু সাঁতারও কাটে। খানিক পর তীরে ওঠে। কলসিটা টেনে নিয়ে আবার পানিতে নামে। ভালো করে ঘষে-মেজে ওপরের পানি সরিয়ে ভরে নেয় কলসিটা। রেখে আসে ওপরে। আলো একটুক্ষণ পানিতে থেকে শেষ ডুবটা দিয়ে তবে ওঠে সে।

পরিষ্কার আলোয় সবকিছু স্পষ্ট এখন। দূরে গাছ-গাছালির আড়ালে গ্রামগুলো জেগে উঠেছে। বউ-ঝিরা কলসি কাঁখে গাঙের পথ ধরেছে।

পুকুরের পাড় বেয়ে বাইরের আঙিনায় এসে পৌঁছল আমেনা। গোয়ালে গাইগুরুটা তখনো ওঠেনি। শুয়ে শুয়েই জাবর কাটছে। পুকুরের ওপারে তালগাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে তফেজ হাজী। তাকে ইশারায় কিছু বলল সে। তারপর খেজুরপাতার বেড়ার মাঝখান দিয়ে সোজা বাড়িতে ঢুকল। মুরগিগুলো ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল, বুড়িটা তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কক কক করে বেড়াচ্ছে উঠোনময়। বারান্দার কাঁথিতে কলসি রেখে আগে কাপড় ছাড়ে সে। তারপর শিকেয় রাখা হাঁড়ি থেকে এক মুঠ চালের খুদ নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দেয়। খুঁটে খুঁটে খায় মুরগিগুলো।

তখন হাজী সাহেব বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বদনা নিয়ে কলসি থেকে পানি ঢালল। গামছা পাকিয়ে সামনে-পেছনে চুল ঝুলিয়ে সপাং-সপাং করে চুল ঝাড়ছিল আমেনা। পানি ঢালার শব্দ পেয়ে তাকাল সেদিকে। বলল, পানি কম কইরি খরচ কইরেন দাদা। তার উত্তরে কিছু বলল হাজী, কিন্তু মুখভর্তিশ পেস্টের ফেনা তা স্পষ্ট হলো না। সেজন্যে তখন তখনই সম্পূর্ণ করল না কথা। ফেলে জিভটাকে ছাড়াল। বলল, দ্যাশ কি মরুভূমি হয় গেছে নাকি? পানির এ্যাতোই অভাব? একরাশ বিরক্তি ফুটে উঠল বাড়িওলির মুখে-চোখে। হাজীর নজরে পড়ল সেটা। হাতের বদনা কাত করে পানি ঢেলে ফেনা ধুয়ে ফেলল সে।

আমেনা বলল, গাঙ থেকি পানি টাইনি আইনতে হয়। আপনের না হয় চাকর-বাকর আছে, বুঝতেই পারেন না। আমার জান বারায়ে যায়।

পানি আনার এই কাজটা ক্রমেই নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খুবই বাজে কাজ। মানে হাজী সাহেব। গ্রামের কোনো টিউবওয়েলেই পানি ওঠে না। পুকুর-ডোবাও সব শুকনো। পানির বদনা নিয়ে উঠোনের পুব কোণে কুমড়োর মাচানের নিচে গিয়ে মুখ ধুতে লাগল সে।

ঘরে ঢুকল আমেনা। একতাড়া নোট এনে হাজীর হাতে ধরিয়ে দিলো।— দেরি হইলো বুইলি কিছু মুনে কইরেন না দাদা।

টাকা গুনে নিয়ে হাজী বলল, ব্যবসা তাহিলে ভালুই চইল্‌ছে, নাকি?

—এডি কি ব্যবসা হইলো, বুলেন দাদা। আমিও বুঝি। কিন্তুক কী কইরবো! প্যাটের দায়। মানষের কথা শুইনলে তো প্যাট্ চলে না।

—মানষের কথাক কান দিবিনি তাহিলেই হোইলো। কথাকে কি চিড়ি ভিজে?

লোকটাকে মান্য করে আমেনা। বিপদে-আপদে সাহায্য করে।

রাত নেমেছে অনেক আগে। জোছনা ফুটেছে আকাশে। দিনের মতো ধবধব করছে পৃথিবী। ভাত-তরকারি বেড়ে ঘরে নিয়ে আসে আমেনা। রান্নাঘরের ঝাঁপ লাগিয়ে দেয়। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে। বাতিটার সলতে নামিয়ে তার তেজ কমায়। আলাদা করে রাখা বাটিটা কোচার নিচে নেয়। তারপর বাইরে বেরোয়। ঘরের দরোজায় তালা লাগিয়ে উঠোনে নামে সে।

পাড়া ভেঙে হোসেনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল আমেনা। খোলা উঠোন। এক কোণে বাতাবি লেবুর গাছ। অন্য কোনে একটা মাত্র মাটির ঘর। তার কোল ঘেঁষে একটা চালার নিচে উনুন। খেজুরপাতার বেড়া দিয়ে দুদিকে ঘেরা। রান্নাঘর সেটা। বাড়ির পেছনে তরিতরকারির বাগান। উঠোনের প্রায় সামনে, ডানপাশ ঘেঁষে একটা আমের গাছ। উঠোনময় আবছা অন্ধকার।

হোসেনের ঘরের বারান্দা বেশ উঁচু। ধাপি বেয়ে ওঠে আমেনা। দরজা ভেজানো। ভেতরে হারিকেনের আলো। শিকল নাড়ল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলল লোসেন। যেন তৈরি হয়েই ছিল সে। হাতে লম্বা সলতের বাতি। উৎসুক চোখ।— আইসো।

বেশ বড় ঘর। পুব-পশ্চিমের লম্বা। ছোট ছোট ছয়টা জানালা। তার সব কয়টা খোলা। পুবের দেয়াল ঘেঁষে একটা চৌকি। ওপরে বাঁশের তাক। তাতে কয়েকটা পোঁটলা। এক পাশে কিছু হাঁড়িকুড়ি। পশ্চিম কোণে কী-সব এলোমেলো পড়ে রয়েছে। তারই পাশে ভাত-তরকারির হাঁড়ি, থালা-বাসন। সেদিকে তাকিয়ে আমেনা বলল, খাওয়া-দাওয়া হয় গেছে নাকি?

—না। ক্যান্?

আঁচলের আড়াল থেকে বাটিটা বের করল আমেনা। লোসেনের চোখে-মুখে বিস্ময়ের ঘোর। সে একবার বাটির দিকে, আরেকবার আমেনার দিকে তাকায়। —কী?

—তরকারি।

—তরকারি ক্যান্?

—তুমি এ্যাতো উপকার করো আমার। আমি তো কিছু দিতে পারিনি কুনুদিন! দুঃখ ঝরে তার কণ্ঠ থেকে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক ফুড়ে।

—কী যে বুলো ভাবি।

তারপর দরকারি কথা সেরে নেয় ওরা।

হোসেন ফেনসিডিল সাপ্লাইয়ের কাজ করে। ভালো আয় তাতে। আমেনাকেও কাজে লাগিয়েছে। সব বুঝিয়ে দেয় সে।— তুমি পাইর্‌বে। কিন্তু সমাধান ভাবি। কেউ যেন জাইনতে না পারে।

সে ঝুঁকি তো আছেই, জানে আমেনা। মাথা নাড়ে সে। অপমান, জেল, সব ঝুঁকি মেনে নিয়েই মাঠে নেমেছে। পেটের দায় যে!

ঘর-বাড়ি যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনই রয়েছে। গরুটা গোয়ালে শুয়ে জাবর কাটছে। মুরগির খোঁয়াড়টা একবার দেখে নিল আমেনা। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকল।

বাতিটা জ্বালছিল টিমটিম করে। তার সলতেটা একটু উসকে দিলো। ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। কেরোসিন বাতির লালচে-কালচে আলো। ইটের ঘর। ঝাড়পোছ করা। ঝকঝকে তকতকে। আর ছিমছাম। খোলামেলা বড়সড় ঘর। মাথার ওপরে টিনের খাড়া চালা। তার নিচে আলকাতরা - লেপা বাঁশের চাতাল। মাটির মেঝে। কাঁঠাল কাঠের চৌকি। টিনের বাস্কটা আগে থেকেই ছিল। স্টিলের আলমারিটা বেচে দিয়েছে কিছুদিন আগে। আলনা ভরা কাপড়চোপড়। বেশ পরিপাটি করে গোছানো। কিছুদিন আগেও এই ঘরে ছিল আরো কত তৈজসপত্র। একে একে সেসব বিকিয়ে গেছে।

চৌকিতে তোষকের ওপর পাতা চাদরটা ঝেড়ে নেয় আমেনা। বালিশ দুটো তার ওপর সাজিয়ে রাখে। আলনার কাপড়গুলো অনর্থক আবার নেড়েচেড়ে গোছায়। ঘুমোতে যাবার সময় এখনো হয়নি, অথচ কিছু করাও নেই। হাতে অঢেল সময়। খুচরো এমন সব কাজ যা না করলেও চলে, সেগুলোই করল সে। তারপর সত্যি-সত্যিই করার মতো আর কোনো কাজ থাকে না। তখন বিছানায় পা ঝুলিয়ে তালপাতার বাতাস খায়। খুব গরম। দক্ষিণের জানালা খুলে দিলো। খাটের ওপর পা তুলে বসল। নদীর দিকে থেকে ঝিরিঝিরি দখনে বাতাস উঠে আসছে। তার শীতল পরশে শরীর - মন কেমন অসাড় হয়ে ওঠে। কাত হয়ে খাটের সঙ্গে হেলান দিয়ে শোয় আমেনা। বিষণ্ণতা গ্রাস করে তাকে। চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকে। খানিকক্ষণ পর কী মনে করে উঠে পড়ে। দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। সাদা জোছনায় পৃথিবীটা ধুয়ে যাচ্ছে। দিনের নিদারুণ দাবদাহে ঝলসে গেছে পৃথিবীর দেহ। এখন দুধের মতো তরল জোছনা আর নদী থেকে উঠে আসা শীতল বাতাসের কোমল পরশ মলমের মতো প্রশান্তি এনে দেয়। গাঢ় তৃপ্তিতে পৃথিবী যেন সুষুপ্তিমগ্ন। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ তা-ই দেখে আমেনা। তারপর আবার ঘরে ঢোকে। দরজা ভিড়িয়ে দেয়। বিছানায় বসে। ঘরেও এক ধরনের স্তব্ধতা জমাট বেঁধেছে। প্রত্যেকটা বস্তুই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। জেগে আছে কেবল বাতিটা। উসকানো শিখা লকলক করে জ্বলছে। মৃদু বাতাসে কখনো কখনা কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শিখা। আর একটানা মৃদু পুড়পুড় শব্দ। সেদিকে তাকিয়ে

থাকতে থাকতে কখন যেন বাতিটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় আমেনা। সলতের পুড়পুড় শব্দ তার বুকের মধ্যে বাজতে থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাস যায়, তবু এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। মাঝে মাঝে দু-এক ফালি কালো মেঘ ভেসে আসে পদ্মার ওপর দিয়ে। কিন্তু নদী পার হয়ে গাঁয়ের আকাশে পৌঁছতে পারে না। কী এক জাদুমন্ত্রে বকের মতো সাদা হয়ে উঠে যায় উঁচুতে। তারপর ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশ।

রোদ তো নয়, গনগনে আগুন। বাতাস যেন ইটের জ্বলন্ত ভাটা থেকে বেরিয়ে আসে। গা-মুখ ঝলসে যায় তার তাতানো ঝাপটায়। একটা আমের বাগানে ছায়ার নিচে দাঁড়ায় আমেনা।

বেলপুকুরিয়া রেলস্টেশনে মাল পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরছে সে।

আমগাছের পাতা রোদে পুড়ে কালচে চিমসে হয়ে গেছে। এবার আমের মুকুল হয়েছিল প্রচুর। গুটিও ধরেছিল ভালো। কিন্তু রসের অভাবে কাঁচা কড়ালি শুকিয়ে হলদে হয়ে ঝরে গেল। এখন সে কয়টা আম টিকে আছে তা-ও বোঁটা শুকিয়ে খসে পড়ছে একটা-দুটো করে। কচি কাঁঠালের বয়স বাড়ে, ধড় বাড়ে না। বামুন মানুষের মতো।

পদ্মার বুকে ঘূর্ণি ঝড় উঠেছে। ওঠে রোজ দুপুরেই। সেই ঘুর্ণিতে মণকে-মণ বালু উঠে যায় আকাশে। দেখে মনে হয় মেঘ জমেছে। কিন্তু সে পানির নয়, বালুর মেঘ, —ধেয়ে আসে ওপরে, লোকালয়ে, ফসলের ক্ষেতে। ঘর-বাড়ি, জমি-জিরেত, সবখানে, খচখচে বালু জমে।

পুকুর-ডোবা খাদ-খন্দক শুকিয়ে খটখটে। মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির। টাঙ্গন গ্রামের সবচেয়ে বড় ও গভীর যে পুকুর, লোকে বলে সোনাদিঘি, তাতে এখন হাঁটুপানি। ঘোলা, লালচে পানি দুর্গন্ধ ছড়ায়। গ্রামের একটা কুয়াও নেই যেখানে এতটুকু পানি আছে। কোনো টিউবওয়েলে পানি ওঠে না। থাকবে কেমন করে! গাঙে পানি নেই যে। গাঙের বুক শুকিয়ে গেলে তার পাড়েও পানির টান পড়ে।

গত বছর বৈশাখে বৃষ্টি হয়েছিল মাত্র দুবার। কিন্তু বর্ষণ ছিল ভারী। সেই বৃষ্টিতেই মাটির অন্তর ভিজে গিয়েছিল। ওই বৃষ্টিতেই জমিতে জো ধরেছিল। লেকে ধান-পাটের বীজ ছিটিয়েছিল। এবার এক কাঠা জমি বুনতে পারেনি কেউ। মাটি দেখলে মনে হয় ঘর্ষণ লেগে ফস করে আগুন জ্বলে উঠবে।

টাঙ্গন গ্রামটা বেশ বড়। আটটা পাড়া নিয়ে গ্রাম। একেকটা পাড়াই ছোটখাটো গ্রামের মতো। প্রত্যেক পাড়ার আলাদা সমাজ, আলাদা কারবার। প্রকৃত গ্রামটা ছিল আরো বড়। এ গ্রামের অনেকটাই এখন পদ্মার গর্ভে। নদীর ভাঙনে জমি-জিরেত হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে কত পরিবার। সে-হিসাব কেউ রাখে না। এ গ্রামের লোকজন সে-কারণে বেশির ভাগই গরিব-গুর্বো, মজুর-জেলে। অধিকাংশেরই জমিজমার পরিমাণ নগণ্য। তার ওপর নির্ভর করে সংসার চলে না। কেউ পরের জমিতে কাজ করে। কেউ নদীতে মাছ ধরে খায়। কয়েক বছর থেকে সে ধারাও পালটে যাচ্ছে। বলতে গেলে গোটা শুকনো মৌসুমে গ্রামে কোনো কাজ থাকে না। নদীতেও মাছ হয় না। অনেকেই এখন নিত্যদিন বানেশ্বর বাজার, কাটাখালী হাট, এমনকী রাজশাহী শহরে যায় মুটে-মজুরি করতে। রোজ ভোরে বাড়ি ছাড়ে ওরা। গ্রাম পেরিয়ে যখন নামে পাড়ার বা মাঠের রাস্তায়, কিংবা তারও পরে গ্রাম পেরিয়ে পাকা সড়কে, তখন আপনা-আপনিই একেকটা দলে বাঁধা পড়ে যায় ওরা। যারা সাইকেলে যায় তারাও তখন মিছিলের মতো একজনের পেছনে আরেকজন লাইন দেয়। আর যারা হেঁটে যায় তারা কাপাসিয়া কিংবা কাটাখালী হাটে গিয়ে বাস ধরে।

মুশকিল হয়েছে তাদের যাদের করে-কর্মে খাওয়ার মতো কিছু জমিজমা এখনো অবশিষ্ট আছে। আগে এ গ্রামে আউশ ধান, পাট, চৈতালি ফসল হতো প্রচুর। আইয়ুব খানের আমলে বসেছিল রিভার - পাম্প। সেট দিয়ে বোরো ও আমন মৌসুমে উচ্চফলনশীল ধান হচ্ছিল অঢেল। হরিয়ানে বিহারি নাসিম খানের সুগার মিল চালু হলো সে-সময়ই। আখের চাষ হয়ে উঠল আরো অর্থকরী। কিন্তু পদ্মার ভাঙনে গ্রামের দক্ষিণ অংশের মাঠ ছোট হতে থাকল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে ভাঙন আরো করাল হয়ে উঠল। তারপর ভারত ফারাক্কার বাঁধ চালু করব। বর্ষায় নদী ভাঙন আরো বেড়ে গেল। রিভার - পাম্প তুলে দিতে হলো। আর শুকনো মৌসুম এলেই নদীটা মরে যেতে থাকল। নদীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুকোতে লাগল পুকুর-দিঘি, খাদ-খন্দক, মাঠ-ঘাট, সবকিছু। বৃষ্টিপাতও কমে যাচ্ছে। শুধু এ গ্রাম নয়, পদ্মার তীর ঘেঁষে যত গ্রাম রয়েছে, পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে মাইল দুই পর্যন্ত, সবখানেই এই পরিস্থিতি। এসব এলাকার জমি এখন মরুভূমির মতো বিরান হয়ে যাচ্ছে। চৈতালি, আউশ, কিছুই আর ভালো হয় না। কৃষিকাজ উঠে যাচ্ছে এসব গ্রাম থেকে। বদলে যাচ্ছে মানুষের পেশা, জীবযাপনের অবলম্বন ও উপায়। যারা এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না তারা পড়েছে চরম দুর্গতির মধ্যে। এই দুর্যোগ থেকে বাঁচতে অনেকেই এখন পৈতৃক ভিটেমাটি বিক্রি করে চলে যাচ্ছে অন্য কোথাও। অন্তত আট-দশটা পরিবার গ্রাম ছেড়েছে গত কয়েক বছরে।

আমেনার বাপ জব্বার মুনশীই প্রথম গ্রাম ছাড়ে। সে ঊননব্বই সালের কথা। নাটোরের উত্তর-পূর্বে সিংড়া থানার খুবজিপুর গ্রাম। আমেনার নানান দেশের সেটা। সেখানে গিয়ে নতুন করে সংসার পেতেছে সে।

কারো নিষেধ শোনেনি মুনসী। সেদিন গ্রাম ছাড়ে সেদিন তার বাড়িতে সে কী ভিড় মানুষের! মানুষ মরলে, কিংবা বিয়ে-শাদি হলে এ-রকম জমায়েত হয় লোকের বাড়িতে। সে-রকম কিছু ছিল না সেদিন। বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে লোকে কখনো বিভুঁয়ে যায়? মুনশীর গলা ধরে পাড়া-প্রতিবেশীর সেকি কান্না!

আমেনাও অনেক কেঁদেছিল। পাড়াতেই বিয়ে হয়েছিল বলে বাপ-মা ছাড়া ব্যথা এতদিন অনুভব করেনি সে। কিন্তু শোনেনি তার বাপ। সে-ও সরে গিয়েছিল। কারণ তার স্বামী ছিল। লোকটা ভালোই রেখেছিল তাকে। বানেশ্বরের হাটে একটা দোকান ছিল তার। পরে জেনেছিল সেটা একটা সাইনবোর্ড ছিল মাত্র। আসলে স্মাগলিং করত লোকটা। তবে সেটা এতটাই ছোটখাটো এবং মৌসুমি যে লোকেরা টের পেত না। তার চাহিদাও ছিল কম। কিন্তু সেই লোকটাও একদিন হারিয়ে গেল। কেউ বলে বিএসএফ বা বিডিআরের গুলিতে মারা গেছে। লাশ ভেসে গেছে গাঙে। কেউ বলে বহরমপুরে নতুন ঘর বেঁধেছে। কোনো কথাই বিশ্বাস হয় না তার। লোকটার চাওয়া-পাওয়ার জেদ ছিল না। কিন্তু তার প্রতি, তার দেহটার প্রতি তার টান ছিল। সেটা বুঝতে পারত আমেনা। আর সে-ও যে তাকে এতটা ভালোবাসত তা-ই কি আগে বুঝেছে কখনো? মাঝে মাঝে ভাবে, এটা কি ভালোবাসা? না নির্ভরতা? লোকটাকে হারিয়ে সে অসহায় হয়ে পড়েছে। ঝড়-বৃষ্টির তুফানের মধ্যে সে যেন ছিল একটা বিশাল ঝাঁকড়া বটগাছ। দালান ঘরের ছাদ। সেই আশ্রয় হারিয়ে এখন সে দিশেহারা হোসেন সুলতানের সাগরেদের মতো। ব্যবসার সঙ্গী। অন্য পাড়ার ছেলে।

আসত মাঝে মাঝে। এখন ঘন আসে। সি কিও যায় তার কাছে। এ নিয়ে পাড়ার লোকদের কথার শেষ নেই। —বিহা কইরলেই তো ঝামেলা চুইকি যায়?

—কী কইরি কইরবে? সুলতান যদিল্ ফিইরি আসে?

এ গবেষণা শেষ হয় না।

নিজেও ভাবে আমেনা। এভাবেই কি চলে? কতদিন চলবে? দিন যেভাবেই হোক চলে যায়। রাত এলেই ভূত ভর করে তার দেহে। সে-ভূতের কত যে বায়না! ঘরের খিল এঁটে, শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে, সারারাত লড়াই করে সে ভূতের সঙ্গে। লড়তে লড়তে এতটাই ধ্বস্থ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে ভোরের জন্যে অপেক্ষা সয় না। পাড়ার মসজিদে ফজরের আজান পড়ে। তখন ঘরের খিল খোলে সে। আর কী আশ্চর্য! খোলা বাতাসের ঝাপটায় ভূত ছুটে যায়। অবসন্ন হয়ে বারান্দার মেঝেয় বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর কলসি-কাঁখে বেরিয়ে যায়। গাঙের পানিতে গা না ধুলে তার দেহের জ্বালা মেটে না।

সেদিন ফজরের আজান পড়তে না-পড়তেই দরজা টোকা পড়ল। কখনো কখনো এভাবে শেষ রাতে ফিরত সুলতান। ধড়মড় করে উঠল আমেনা। ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। —কুষ্টে ছিলে তুমি? এ্যাতো দিন কুষ্ঠে ছিলে? ঝাঁপিয়ে পড়ে সে পুরুষটার ওপর। তাল সামলাতে পারে না তারা। মেঝেয় গড়াগড়ি খায়। চুমতে— কামড়ে পুরুষটাকে নাস্তানাবুদ করে ফেরে আমেনা। পুরুষটাও সাড়া দেয়। একতাল সেন্ধ ময়দার মতো নরম ও উষ্ণ নারীদেহটাকে ডলে-পিষে যেন রুটির 'লেই" বানিয়ে ফেলে। তারপর তাকে দুহাতে তুলে নিয়ে বিছানায় যায়।

যখন ভূত ছাড়ে তখন জানালা গলে আসা ফিকে আলোয় ঘরটা আবছা দৃশ্যমান। পরস্পরকে ছেড়ে ওঠে ওরা। ফুঁপিয়ে কাঁদে আমেনা।—এ তুমি কী কইরলে হুসেন? তুমি আমার এ সব্বোনাশ ক্যান কইরলে?

—কী কইরি যে হয়া গ্যালো! ঐ অবস্থাত্ তুমাক দেইখি আমি ঠিক থাকতেই পারিনি। বিশ্বাস করো।

—কিন্তুক আমার যে মহা সব্বোনাশ হয়া গ্যালো হুশেন!

—তুমি ভাইবো না। আমি তুমাক্ বিহা কইরবো। তুমাক্ আমি ঠগাবো না। জবান দিচ্ছি। আমি তুমাক্ ভালবাসপো। আমি সুহতানের মুতন না। শালা কঞ্জুষের ব্যাটা কঞ্জুষ! তুমার কী কদর কইরতো বুলো? তুমি রূপ। তুমার যৈবন, কিসের দাম উই দিইছে?

এ-কথা মিথ্যে নয়। মানে আমেনা। দেহটা ছাড়া আর কিছু বুঝতো না লোকটা। একটা চাবি দেওয়া যন্ত্র ছিল সে। স্বামীর অবহেলায়, উদাসীনতায়, কতদিন মনে মনে কেঁদেছে।

হোসেনকে কথায় পেয়েছে। যেন অনেক দিনের বন্ধ দুয়ার খুলে গেছে এক ধাক্কায়। এখন কথার প্লাবন শুরু হয়েছে। —তুমার দিক তাকায়ে আমার জান ফাইটি যাইতো। শালা বান্দরের গলাত্ সুনার মালা গো! খালি মুনে হোইতো, তুমার মুতন বো পাইলে আমি রাজরানী বানায়ে রাখতু। আর মুনে হোইতো, শালাকে যমে ল্যায় না ক্যান! তুমি দুশ্চিন্তা কইরো না ডাল্লিং, তুমাক্ আমি অর চায়ে অনেক বেশি ভালবাসবো। তুমার কুনু কষ্ট রাখফো না। হ্যাঁ, কসম আল্লার! আবেগে তাকে বুকে টেনে নেয় হোসেন। বাধা দেয় না আমেনা। কিন্তু কেমন যেন আগ্রহও পায় না। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবে সে। অথচ এখন তার সেই বোধও হচ্ছে না।

আমেনার গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে হোসেন বলল, বিডিআরের এক মেজর আইছিসে। শালা জব্বর খতরনাক লোক। অডার দিইয়ে দেখলেই গুলি! বডার তো বডার, মানষের বাড়িত বাড়িতও বুলে ছার্চ কইর্ছে। এ্যাখুন কদিন গা ঢাইকি থাইকতে হবে। বুলা তো যায় না।

উঠল সে। দরোজার কাছে গিয়ে কী মনে হলো, ঘুরে দাঁড়াল। বলল, সাঞ্জের পর আইসো। কথা আছে।

বুক টিপ-টিপ করে আমেনার। সুলতানের কথা মনে পড়ে। সেদিনও লোকটা এ-রকম ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, বডারের অবস্থা ভালো না। কুন শালার এক ক্যাপ্টেন আইসিছে। খুব বুলে ট্যাঠা!

—বডারে না হয় যায়ো না আইড!

কথা কম বলত সুলতান। কোনো উত্তর করেনি সে। তারপর কী হয়েছিল কে জানে! কেউ কিছু বলতে পারে না। তার প্রিয় সাগরেদ হোসেনও না। অথচ তার জানা উচিত ছিল। লোকে বলে, সুলতান আর লোসেনের ছিল এক পেট, এক দিল। তার এ-ও বলে, এ-রকম হয়। মানুষ যত কাছেরই হোক, তার মধ্যেই একটা অনতিক্রম্য ফারাক থেকেই যায়। তা না-হলে একেকটা মানুষ আলাদা হবে কী করে! এখন লেসেন চলে যাওয়ার পর এসব চিন্তা তার মাথায় আসছে। একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে সে। তবু, এর মধ্যেই, গাঙের উদ্দেশে বের হলো আমেনা।

আজ সূর্যটা বড্ড ক্লান্ত যেন। আকাশের সুনীল সমুদ্রে সাঁতার কেটে পেরে ওঠে না। হয়তো গরম আঁচ ছড়াতে ছড়াতে সে নিজেও জীর্ণ-শীর্ণ, অবসন্ন। সন্ধেটা নামল যেন আরো দেরিতে। আর তার লালিমা যেন কাটতেই চায় না। চাঁদটাও আজ পথ ফুলে অন্য কোনো দিকে চলে গেছে কি না কে জানে! তার কোনো খবর নেই। সেজেগুজে বসে আছে আমেনা। পরিপাটি শাড়ি পরেছে। সিঁথি কেটেছে। কপালে টিপ পরেছে। মুখে প্রসাধন করেছে। একটু সেন্টও লাগিয়েছে। আর সারাটা বিকেল ধরে বেঁধেছে। হোসেনের পছন্দ সে জানে। একা মানুষ যখন - তখন এসে খেতে চাইত। খাইয়ে খাইয়ে তার পছন্দ-অপছন্দ জানা হয়ে গেছে। চালের আটার রুটি, ঝাল বেশি দিয়ে মুরগির পোশ্ত, আর কড়া মিষ্টির পায়েস।

এশার আজানের পর বেরোলো আমেনা।

ফকফকে জোছনায় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। তামাম প্রকৃতি যেন বুকে হাত গুটিয়ে চুপ করে ভিজছে জোছনার বৃষ্টিতে। কখনো এক-একটু ঝিরিঝিরে বাতাস দেয় কি দেয় না। পাড়ার রাস্তা এড়িয়ে মাঠের পথ ধরল আমেনা। পথে দুটো শেয়াল পিছু নিয়েছিল। হয়তো গোশ্তের মেশলাদার গন্ধে তাদের জিভ চটকাচ্ছিল কিন্তু কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। পেছন দিক দিয়ে হোসেনের বাড়ির সামনে গিয়ে উঠল আমেনা।

বারান্দায় পার্টি ফেরে বসে ছিল হোসেন। হ্যারিকেন জ্বলছিল। তার টিমটিমে আলোয় উঠোনময় ছায়া-ছায়া রহস্য। আমেনাকে দেখে এগিয়ে গেল সে। হাত ধরে তুলে আনল ওপরে। তারপর ঘরে।

—আর ইট্টুক দেরি কইরি আইসতে না-হয়? কে না কে দখেফে, তারপর কী না কী রটাবে!

—লিজের ভয়ই যখুন কাইটি গেলছে তখন মান্‌ষেক্‌ আর ভয় কিসের, বুলো? আর তুমি তো পুরুষ মানুষ?

এ-কথার মানে বুঝতে পারে না হোসেন। সে একটু হাসে কেবল।

খাবার বাড়ল আমেনা। এটা-সেটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করল হোসেন।

—জানো আমেনা...

কথাটা কানে লাগে। তার নাম ধরে কখনা, কোনো দিন, তাকে ডাকেনি হোসেন। চোখ তুলে তাকাল আনো। মাথায় ঘোমটা ছিল বলে তার চোখ দেখা যাচ্ছে না। হোসেন বলে চলেছে — তুমার লেগি আমার মুন পুইড়ুতো। দেখতে না, এই-সেই বাহানাত্‌ খানি তুমার কাছে যাতু?

সেটা কখনো অনুভব করেনি আমেনা। পাড়ার ছেলে। প্রায় সমবয়সী। সুলতানের সঙ্গে ব্যবসা করে। সব মিলিয়ে সম্পর্ক সহজ ছিল সবসময়।

—আসলে তুমাক ভালোবাসতু আমি। তুমি যে কী ছাই বুইঝতে পারতে না! ক্যান বুলো তো?

—মুখ ফুইটি তো বুলোনি কুনুদিন?

—মুখে বুইল্‌বো ক্যান্‌? একটা জুয়ান মানুষের চোখের ভাষা তুমি বুইঝ্‌তে পারতে না?

—তখন অতো কি আর তুমার চোখের দিক্‌ তাকাতু?

—আমি পাগল হয়া গেলছুনু বুইঝলে?

গোশ্‌ত-রুটি বেড়ে সামনে এগিয়ে দেয় আমেনা। —এ্যাখুন কথা রাইখি খাও তো।

চেটেপুটে সবটুকু খেয়ে নেয় হোসেন। একবার আমেনার মুখে তুলে ধরেছিল। খায়নি সে।

বাসনগুলো ধুয়ে গুছিয়ে নিল আমেনা।

তারপর কি মনে হতে বলল, আচ্চা, এডি কি তুমি ফেইলি আইসিছেলে? বলে কোমর থেকে একটা ম্যানিব্যাগ বের করে এগিয়ে ধরল।

—আরে হ্যাঁ, তাই তো! একটু যেন বোকার মতো হাসল হোসেন।

—এ্যামুন বোকার মতুন কাম মানুষ করে? অনেকগিলিন ট্যাকাও আছে দেখছি! একবার মুনে হোইলো তুমার ভায়েরই হবে। এ রকুম একটা ছিল আর। তারপর মুনে করনু অরডা কোত্থেকি আইস্‌পে? এডি তো আর সাথেই গেলছে। তখুন তুমার কথা মুনে হোইলো। ঠিক তুমারই হবে। দেইখি ল্যাও, একটা ট্যাকাও কিন্তু আমি লিইনি। পরে যেন আবার অপবাদ দিও না।

হাসল হোসেন। —আরে না। কী যে বুলো!

কোনো উত্তর না দিয়ে উঠল আমেনা।

—থাক্‌পে না?

—আইজ না।

কানের কাছে মুখ এন ফিসফিস করে লোসেন বলল, আইস্‌পো শ্যাষ্‌ রাতেই?

যেতে যেতে, যেন ছেনালি করছে এমন ভঙ্গিতে, আমেনা বলল, পাইরলে আসসো!

গায়ের কাপড় আলগা করে দেয় আমেনা। পদ্মা নদীর পানি একান্ত আপনজনের মতো সারাদেহে আদরের পরশ জাগিয়ে রাখে। যেন চারদিক থেকে বাহুবেষ্টনে জাপটে নেয় তাকে। নিজের শরীরে নিজেই হাত বুলাতে গিয়ে তৃপ্তির আবেশে তার চোখ বুজে আসে।

শরীরে ময়লা তুলতে শুরু করল সে। বারংবার ডলন-পেষনে একটু - আধটু ময়লা ওঠে কি ওঠে না, সাদা ত্বকে লাল লাল ছোপ জেগে ওঠে। ডহতে ডলতে নাভির একটু নিচে গিয়ে আঙুলগুলো আপনা-আপনি বারবার আপর্তন করতে থাকে। একসময় তার অজান্তেই হাতটা থেকে যায় সেখানে। পেটের কমনীয় উজ্জ্বলতার ওপর সেখানে একটা বাদামি রঙের কাটা দাগ। সুলতানের নিষ্ঠরতার চিহ্ন। একসময় সংবিত ফেরে তার, তখন ঘাড় নামিয়ে চোখ ফেরায় সে দাগের দিকে।

সূর্যটা ততক্ষণে মাথা তুলে হাসছে। সাদা আলোয় গোটা পৃথিবী ঝকমক করছে। নদীর স্রোতে আলোকরশ্মিগুলো ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিটি জলকনায়। বাতাসের কোমল চুম্বনে চিকচিক করছে তাদের মুখ।

ময়লা তুলতে ভুলে যায় আমেনা। ক্ষতচিহ্নটায় হাত বোলাতে থাকে। অভিমানে সোহাগ চকচক করে তার চোখে-মুখে। পরক্ষণেই কী এক অপমানবোধে, যন্ত্রণায়, কাতর হয়ে পড়ে । হিংস্র ক্ষিপ্ত হাতে ঘর্ষণের পর ঘর্ষণ দিতে থাকে। যেন ডলে, ঘষে তুলে ফেলতে চায় দাগটাকে। অবোধ এক ভালো লাগার কাছে সেরে যাওয়ার যে অপমান তার চিহ্ন পরিস্ফুট তার আদলে। চোকের পাতা তিরতির করে কাঁপতে থাকে। অশ্রু টলমল করে দুচোখে। তার দৃষ্টির সামনে উঁচু-নিচু বিশাল চর কেঁপে কেঁপে ভেঙে ভেঙে যেতে থাকে। যেন এক প্রলয় চুরমার করে ফেলছে সবকিছু। বায়োস্কোপের সাদা পর্দার মতো তার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায় দৃশ্য। শুধু ভাসতে থাকে ঝাপসা। ধোঁয়া। সে-ধোঁয়াও একসময় কেটে যায়। তার দৃষ্টির সামনে তখন কালো পাহাড়ের মতো উঁচু নদীর অপর পাড়টি আবার ফিরে আসে দৃষ্টিগোচর হয় তার চোখের অশ্রু উষ্ণ। আর নদীর পানি শীতল। এইটুকু যা তফাৎ!

পানিতে ঝাঁপ দেয় আমেনা। হাত-পা ছোড়ে এলোপাতাড়ি। যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে। যেন এই ভালোলাগা, এই অপমান, লজ্জা ও যন্ত্রণার জন্যে দায়ী এই নদীটাই। নখ দিয়ে খামচে দিচ্ছে তার মুখ। কিল আর লাথি মেরে নাস্তানাবুদ করছে তাকে। কিন্তু একসময় সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন এক বুক পানিতে শরীর ডুবিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

কী বিশাল এই গাঙ! এই পদ্মা নদী। ভার বর্ষায় এ-কুল থেকে ও-কুল নজরে আসে না। আর কী-ই না পরিণতি আর এই শুকনো মৌসুমে! শুধু চর আর চর। চরে চরে বন্দি হয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে অনাহারী কুকুরের মতো। আমেনার মনে হয়, তার জীবনটাও এই গাঙের মতো বালির চড়ায় আটকে গেছে। এই চড়া ভেঙে উতরে চলার শক্তি তার আর কোনোদিনই হয়তো হবে না। হঠাৎ দুমড়ে-মুচড়ে ওঠে তার নরম বুক। বুকের মধ্যে

একটা বরফ-শীতল কঠিন দলা ক্রমেই বড় হতে থাকে। তার বুক ঢিপ-ঢিপ করছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তারপর সে-ও একসময় মিইয়ে আছে। তখন আবার হালকা হয় সে।

কখন ভোর কেটেছে। পুবের আকাশে সূর্যটা ঝিকঝিক করছে। তবু উঠতে মন চাইছে না আমেনা। সাঁতার কাটে। ডুব দেয়। পানি ছিটায়। খেলা করে। পেটেজর নিচে কলসি উবুড় করে ধরে ভাসতে থাকে। যেন সেই বালিকা বয়স ফিরে পেয়েছে। একসময় তফেজ হাজির গলা পেয়ে উঠল সে।

—হ্যাঁ, যা ভাইবিছি তাই।

—ক্যান, দাদা, কাইলই যে ট্যাকা দিনু! আবার আইজ ক্যান?

—ট্যাকা না, ট্যাকা না। খবর শুইনি গেনু তোর কাছে। তে দেখছি যে তুই নাই।

—কী খবর, দাদা?

—সাংঘাতিক খবর! হুসেন বিশ খায়ে মইরিছে।

—কী বুইলছেন?

—সত্যি কথা রে বইন।

বালুর ওপরেই বসে পড়ল আনো।— সত্যি বুইল্ছেন, দাদা?

—সত্যি! লিজের চোখে দেইখি আনু! তামান পাড়ার লোক দেখচে। মরই ঘরের ভিতরেই পইড়ি আছে।

—আমার কনু দুঃখ নাই, দাদা। আমার লিজের সুয়ামিক মাইর্লো... তার লাশডা যে আমি চোখের দেখাও দেখতে পানুনি!

হতাশ হলো হাজী। সে মনে করেছিল, ব্যবসায়ী পার্টনারের মৃত্যু সংবাদে কাতর হবে আমেনা। টাকা-পয়সা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে। কেননা, এর সঙ্গে তার টাকার ব্যাপারও জড়িত। —কিন্তুক ম্যা মানুষের আঠারো কলা। বুঝা মুশকিল! মনে মনে ভাবল সে।

—আপনে এ্যাখুন যান দাদা। আমি জানডাক আর ইট্টুক ঠান্ডা কইরি আসি।

স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই ফাল্গুনের বালুঝড়ের মতো কেমন যেন আলভোলা হয়ে গেছে মেয়েটা। তারপর হোসেন ছিল। বিপদের দিনে লোকটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। রক্তের কেউ না হলেও একসঙ্গে ব্যবসা করত। সেই লোকটাও মরল। মেয়েটা এখন পাগল না হয়। আমেনার আচরণ দেখে তার সে-রকমই বোধ হলো। এখন নিজেকেই ভারী বোকা মনে হচ্ছে হাজীর। সে দ্রুত বিদায় নিল।

শাড়ি পেঁচিয়ে বেঁধে শক্ত করে পড়ে আমেনা। তারপর গাঙে ঝাঁপ দেয়। ঝাঁপাঝাঁপি করে, আর কাঁদে। ডুব দেয়, আর কাঁদে, ঝাঁপ, ডুব আর কান্না, যতক্ষণ না ক্লান্তি চাবে। তবু যেন অনেক হালকা মনে হয় শরীরটা। মনটাও কেমন যেন ফুরফুর করে।

কলসি কাঁখে পাড়ে ওঠে আসে আমেনা। সামনে পোয়া মাইলটাক চর। তারপর আকাশছোঁয়া তালগাছটা। সেখানেই তার বাড়ি।